Visit http://www.asram.org

পুস্তকগুলোর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

আদিপুস্তক

হিব্রু বাইবেলের প্রথম অংশের নাম תורה (তোরাহ্) অর্থাৎ 'বিধান' (গ্রীক ভাষায় অনূদিত বাইবেলের এই প্রথম অংশের নাম 'পঞ্চপুস্তক')। ঈশ্বর বিধান দান করেছিলেন যেন সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে ইস্রায়েল তাঁর নানা প্রতিশ্রুতি ও আশীর্বাদের পাত্র হতে পারে। কিন্তু বিধান দেবার আগে ঈশ্বর অন্যান্য আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন যেগুলো আদিপুস্তকের আলোচ্য বিষয়: ঈশ্বরের সৃষ্টি তাঁর আশিসে পূর্ণ, মানুষের অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাঁর উচ্চারিত আশীর্বাদ রক্ষা করে থাকেন, একথা ইস্রায়েলকে মনোনয়নের সূত্রপাত তথা আব্রাহামকে আহ্বানেই বিশেষভাবে প্রমাণিত।
(১:১–২:৩) বাইবেলে 'সৃষ্টি' শব্দটা কেবল ঈশ্বরের বেলায় ব্যবহৃত; অর্থাৎ কোন মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, কেবল ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা: মানুষ কিছুটা তৈরি বা নির্মাণ করতে পারে বইকি, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি তার নেই যেহেতু সৃষ্টি বলতে জীবনমণ্ডিত করাই বোঝায়, আর মানুষের নির্মিত বস্তু জীবনমণ্ডিত নয়। অতএব স্রষ্টা বলে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে জীবনমণ্ডিত করে তার যত্নও নেন পাছে সৃষ্টবস্তুর মৃত্যু ঘটে। একথা ছাড়া বাইবেল এ সত্যও স্মরণ করায় যে, স্রষ্টা হওয়ায় কেবল ঈশ্বরই আরাধনার যোগ্য, কোন সৃষ্টবস্তু আরাধনার যোগ্য নয়। প্রাক্তন সন্ধির পরবর্তীকালীন পুস্তকগুলোতে আমরা দেখি যে ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা বা বাণী দ্বারাই নিখিল সৃষ্টি করলেন। খ্রীষ্টই সেই স্রষ্টা-বাণী; আরও, পুনরুত্থান করে তিনিই নবসৃষ্টির আদর্শ (যেরে ১৮:৬; সাম ১০৪; প্রবচন ৮:২২; যোহন ১:৩; কল ১:১৫–১৮)।

- ঈশ্বর এক সপ্তাহে সৃষ্টিকর্ম সাধন করলেন: বর্ণনার উদ্দেশ্য এ, মানুষ সপ্তাহের প্রত্যেক দিন স্রষ্টাকে স্মরণ করে দিনটাকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করবে; কালও ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই মানুষ যেন কাল বা রাশির পূজা না করে।

যাত্রাপুস্তক

যাকোবের বারোজন সন্তানের কথা উল্লেখ করে যাত্রাপুস্তক আদিপুস্তকের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ইস্রায়েল সন্তানেরা অত্যাচারিত, কিন্তু প্রভু তাদের মুক্তি আদায় করেন। তারা হবে তাঁর মনোনীত জনগণ, উপাসকই এক জনমণ্ডলী, এবং ঈশ্বর তাদের মাঝে বাস করবেন।

লেবীয় পুস্তক

যাত্রাপুস্তকের শেষ অংশ উপাসনা-কর্মের বাহ্যিক বিষয় তুলে ধরে, যেমন যাজকদের পোশাক ও নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। লেবীয় পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ও উপাসনা, কিন্তু এর আন্তর দিকও তুলে ধরা হয়, যেমন উপাসকের পবিত্রতা। পবিত্রতা গুরুত্বপূর্ণই এক বিষয়, যেহেতু যাঁর আরাধনা করা হয়, তিনি পরমপবিত্র, আর তিনি পবিত্র উপাসকই দাবি করেন। আরও, ইস্রায়েল জাতির উপাসনা-কর্ম কেবল আবাসে প্রকাশ পাবার কথা নয়, জনগণের সমগ্র সামাজিক জীবনও উপাসনা-কর্ম, ফলে ইস্রায়েল সর্ববিষয়েই পবিত্র হতে আহূত।

গণনাপুস্তক

প্রতিশ্রুত দেশের দিকে (যাত্রাপুস্তকে শুরু করা) মনোনীত জাতির যাত্রার নানা ধাপ, এবং সেই যাত্রাপথে তারা কেমন করে চলবে, এ হল গণনাপুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় বিবরণ

এই পুস্তক 'বিধানের' পঞ্চপুস্তকের উপসংহার বলে গণনা করা যায়: আদিপুস্তক থেকে গণনাপুস্তক পর্যন্ত ঈশ্বর যা যা সাধন করে এসেছেন, দ্বিতীয় বিবরণ তার সময়োপযোগী একটা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন অর্পণ করে। আরও, দ্বিতীয় বিবরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেননা অধিকাংশ পরবর্তী পুস্তকগুলো তার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা চিহ্নিত।

যোশুয়া

এই পুস্তক হিব্রু বাইবেলের נְבִיאִים (নেভিইম) অর্থাৎ 'নবীগণ' নামক দ্বিতীয় অংশের প্রথম পুস্তক। পঞ্চপুস্তকের বিষয়বস্তু ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও নানা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা: তা ইস্রায়েলকে মনোনয়ন ও বিধান দানেই সাধিত হয়েছিল। এবার আসছে সেই পরিকল্পনা ও নানা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সময়: প্রতিশ্রুত দেশ এখন বাস্তবই এক দেশ যা ইস্রায়েল ভোগ করে—ঈশ্বর আপন কথা রক্ষা করেছেন, তিনি সত্যি বিশ্বস্ত ঈশ্বর। কিন্তু ইস্রায়েলকেও ঈশ্বরের সঙ্গে সেই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতে হবে, বিধান পালনেই নিজের বিশ্বস্ততা দেখাবে। তেমন কাজে নবীদের ভূমিকা অপরিহার্য: তাঁরাই ইস্রায়েলকে শেখাবেন কেমন বাধ্যতা দেখিয়ে বিধান পালন করা দরকার। যোশুয়াই প্রথম এই ভূমিকা অনুশীলন করেন।

বিচারকচরিত

যোশুয়া পুস্তক দেখিয়েছিল, বাধ্যতার ফলে ইস্রায়েল প্রতিশ্রুত দেশ দখল করতে কৃতকার্য হয়েছিল; অপরদিকে বিচারকচরিত দেখায় যে, ঈশ্বর নানা উদ্ধারকর্তা প্রেরণ করা সত্ত্বেও অবাধ্যতার ফলে ইস্রায়েল প্রতিশ্রুত দেশ থেকে কানানীয়দের বঞ্চিত করতে অকৃতকার্য।

রুথ

ক্ষুদ্র এক পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের যত্নে সমগ্র ইস্রায়েল জাতির প্রতি তাঁর যত্ন প্রকাশ পায় যেহেতু রুথের ভাবী বংশধর হয়ে দাউদের উদ্ভব হবে। মুক্তিকর্ম সাধন প্রসঙ্গও লক্ষণীয় (দ্রষ্টব্য 'মুক্তিকর্ম', শব্দকোষ)।

সামুয়েল (১ম ও ২য় পুস্তক)

বিচারকচরিতের শেষ দৃশ্য অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলারই এক দৃশ্য ছিল; ইস্রায়েল জাতির তেমন পরিস্থিতি সঠিক করার জন্য রাজ্য-প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন, এটিই সামুয়েল দুই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। সেই সঙ্গে পুস্তক দু'টোর ঐশতাত্ত্বিক দিকও মনের সামনে রাখা প্রয়োজন: ইতিহাস-পরিচালনায় ঈশ্বর দুর্বল, অবনমিত ও শেষজাতককেই বেছে নেন—একথা প্রথম পুস্তকের শুরুতে (আন্নার সঙ্গীতে) ও দ্বিতীয় পুস্তক শেষে (দাউদের ধন্যবাদগীতিকায়) প্রতীয়মান। উভয় সঙ্গীত গভীরতর মসীহমুখী প্রত্যাশাও তুলে ধরে।

রাজাবলি (১ম ও ২য় পুস্তক)

রাজাবলির ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো নিতান্ত নাটকীয়: আদর্শ ধর্মরাজ দাউদের উজ্জ্বল রাজত্বকাল থেকে ঈশ্বরের জনগণ আস্তে আস্তে নির্বাসনেরই দিকে চলে যায়; এর কারণ, তাদের নিজেদের ও তাদের রাজাদের পাপাচরণ। অথচ নবীদের বাণী দ্বারা ঈশ্বর তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন: তাঁরা সারাক্ষণ এই সাবধান বাণী দিয়েছিলেন যে, বিধানের প্রতি বাধ্যতা না দেখালে পরিত্রাণ থাকবে না, আসবে ঈশ্বরের বিচার। তবু রাজাবলির শেষ কথা বিনাশের নয়, প্রত্যাশারই কথা—মসীহ এসে অনুতপ্ত জনগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করবেন, সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততা যে সর্বনাশ ঘটিয়েছিল, মনপরিবর্তন তার প্রতিকার সাধন করবে।

বংশাবলি (১ম ও ২য় পুস্তক)

এই পুস্তক দু'টো হিব্রু বাইবেলের 'অন্যান্য লেখা' নামক অংশের শেষ পুস্তক, সুতরাং হিব্রু বাইবেলের শেষ পুস্তক। পুস্তক দু'টোর উদ্দেশ্যই নির্বাসন-দেশ থেকে ফিরে আসা জনগণের কাছে ইস্রায়েলের ইতিহাসকে ঈশ্বর ও দাউদের মধ্যে চিরকালীন এক সন্ধি রূপেই ব্যাখ্যা করা; এমন সন্ধি যা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতাই দাবি করে: ইস্রায়েল বাধ্যতা দেখালে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন, তারা অবাধ্য হলে ঈশ্বর শাস্তি দেন; অতীতকালে ঈশ্বরের যে ইচ্ছা, তা বর্তমানকালেও বলবৎ থাকে; মানুষ ঈশ্বরের বাণী দ্বারাই তাঁর ইচ্ছা জানতে পারে। তেমন উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য পুস্তক দু'টো সামুয়েল

ও রাজাবলিতে সঙ্কলিত ঘটনাগুলোর উপর নির্ভর করে এবং তেমন ঘটনাবলির মূল্যায়ন ও বিচারও করে, বাধ্যতা-অবাধ্যতাই মূল্যায়ন ও বিচারের নীতি।

এজরা - নেহেমিয়া

এই পুস্তক দু'টোর মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য প্রতীয়মান: এজরা ১–৬ নির্বাসিত লোকদের প্রত্যাগমন ও প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণকাজের কথা বলে; ৭–১০ অধ্যায়ে এজরার আগমন ও তাঁর সংস্কার-কর্ম বিবৃত। নেহেমিয়া ১-৬ যেরুসালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণকাজ বর্ণনা করে; ৭–১৩ এর আলোচ্য বিষয় হল জনগণের জীবন-নবায়ন। এক দিকে এজরা ধর্মনেতা রূপে, অপরদিকে নেহেমিয়া সামাজিক নেতা রূপে যেরুসালেম ও জনগণের নবায়নে নিবিষ্ট থাকেন; এসময়েই ইহুদী উপাসনা-কর্ম নতুন চেহারা অর্জন করে যা যজ্ঞ-রীতির চেয়ে ঐশবাণী-পাঠ ও শ্রবণের উপরেই প্রাধান্য আরোপ করে।

তোবিত

সৎকর্ম সাধনে অধ্যবসায়ই এই সুন্দর পুস্তকের আলোচ্য বিষয়; ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রভুর মঙ্গলাশিসের পাত্র। সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পুস্তকটা কেবল গ্রীক ও সিরীয় অনুবাদে পাওয়া যেত; কিন্তু কিছু বছর আগে কুম্রানে হিব্রু ভাষায় লেখা কিছুটা পাঁকানো পুঁথি পাওয়া গেছে।

যুদিথ (পুস্তকটা হিব্রু নয় গ্রীক বাইবেলেরই অন্তর্ভুক্ত পুস্তক)

যুদিথ নামের অর্থই ইহুদী নারী, তাই তিনি আদর্শবতী বিশ্বস্তা ইস্রায়েল-কন্যা বলে উপস্থাপিতা, আর তাঁর এই বিশ্বস্ততার জন্যই শত্রু-শক্তির উপর বিজয়িনী হন। নারীদের বিষয়ে বাইবেল মাঝে মাঝে বেশ কঠোর বিচার ব্যক্ত করে একথা সত্য, কিন্তু এজন্য সেই সকল নারীদের কথা ভুলতে নেই যাঁরা সত্যিকারে সবদিক দিয়ে অধিক সম্মানের যোগ্যা, যেমন: মোশীর মা যিনি ফারাওকে ভয় না করে নিজ শিশুকে বাঁচান, মোশীর বোন যিনি ভীতা না হয়ে নদীতে ভাস্যমান ঝাঁপিটা নজরে রাখেন, রুথ যিনি শাশুড়ীর প্রতি ভালবাসার খাতিরে স্বদেশ ত্যাগ করেন, এবং এই যুদিথ ও সেই এস্থার যাঁরা স্বজাতির পরিত্রাণের জন্য নিজ নিরাপত্তা বিষয়ে চিন্তাটুকু না করে প্রাণের ঝুঁকি নেন। প্রাক্তন সন্ধির সঙ্গে নবসন্ধিও এক সুরে অধিক সম্মানের যোগ্যা নারীদের কথা তুলে ধরে, যেমন যীশুর ধন্যা মাতা মারীয়া ও সেই সকল নারী যাঁরা ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং রবিবার দিনে, বেশ ভোরেই, যীশুর সমাধিস্থানে গিয়েছিলেন। এখানে দেওয়া উদাহরণ অল্প বটে, তবু মনে প্রশ্ন ওঠে, কিসের উপর নির্ভর করে সেই নারীসকল পুরুষদের চেয়েও বেশি সাহস দেখিয়ে চিরস্মরণীয় আদর্শ রেখে গেলেন? উত্তর এই পুস্তকে (ও অন্যান্য পুস্তকেও) পাওয়া যায়: তাঁরা প্রভুর প্রতি বিশ্বস্তা ছিলেন, কঠোর তপস্যার সঙ্গে প্রার্থনা করতেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তিতা ছিলেন, এবং তাঁদের তেমন আত্মোৎসর্গে ঈশ্বর নিজেই ছিলেন তাঁদের শক্তি।

এস্থার

এই পুস্তক ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বরের রক্ষা, ও ইস্রায়েলের অত্যাচারীদের প্রতি তাঁর শাস্তির কথা তুলে ধরে। লক্ষ করার বিষয়টা হল এ যে, পুরিম-পর্ব পালন করার সময় ইহুদীরা হামানের ফাঁসির জন্য আনন্দ করবে না (বস্তুতপক্ষে সমাজগৃহে সেই সমস্ত বাণী একেবারে নিচু গলায় ও দ্রুতই পাঠ করা হয়) বরং তাদের মুক্তিলাভের আনন্দ গরিবদের প্রতি দানশীলতায় প্রকাশ পাবার কথা।
** এস্থার পুস্তকে বাঁকা অক্ষরে যা লেখা আছে, তা হিব্রু মূলপাঠের নয়, গ্রীক পাঠেরই অংশ-বিশেষ।

মাকাবীয় বংশচরিত (১ম ও ২য় পুস্তক)

গ্রীক সভ্যতায় কবলিত না হবার জন্য ইহুদীরা যে কেমন তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিল, তা-ই এই পুস্তক দু'টোর আলোচ্য বিষয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক উভয়েই একই সময়ের ঘটনাবলি বর্ণনা করে; পার্থক্য এ: প্রথম পুস্তকের চেয়ে দ্বিতীয় পুস্তক অধিক উপদেশমূলক ও চেতনাদায়ী বাণী উপস্থাপন করে। উভয় পুস্তক হিব্রু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু যে গ্রীক পাঠ বেঁচে গেছে তা খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর হিব্রু মূলপাঠের অনুবাদ।

যোব
বাইবেল মানুষকে আমন্ত্রণ করে যেন সে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যোবের যে সংগ্রাম তাতে যোগ দেয়। ঈশ্বর যোবকে ভালবাসেন, তাঁকে শুধু যাচাই-ই করেন, এজন্য ঈশ্বর ধর্মময় ও যোবের সঙ্গে আমরাও তাঁকে দুঃখকষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কিন্তু তবুও দুঃখকষ্টের সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে, আর সেজন্য ঈশ্বর আত্মপক্ষসমর্থন করতে বাধ্য; তথাপি তিনি যোবের প্রশ্নের উত্তর দেন না, বরং বারবার বলেন যে, মানুষ ঈশ্বরের মন বুঝতে সর্বদাই অক্ষম; এর প্রমাণস্বরূপ তিনি সৃষ্টির উপরে তাঁর প্রভাব দেখান যা দেখা সত্ত্বেও মানুষ বুঝতে অক্ষম। এক কথায়, ঈশ্বর চান, মানুষ নিজের মানবীয় সমস্যার দিকে তত মন না দিয়ে ঈশ্বরেরই দিকে মনোযোগ ফেরান। (এবিষয়ে একথা বলা বাঞ্ছনীয় যে, দুঃখকষ্টের প্রশ্নে ঈশ্বর শেষ উত্তর যীশুতেই দিয়েছেন: যীশুও যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র সরাতে ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় প্রাধান্য দিলেন, তাই ঈশ্বর সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বিশ্বপরিত্রাণ সাধন করলেন; আর সর্বকালের মানুষের জন্য সাধু পল বলেন যে, আমাদের দুঃখকষ্ট যীশুর যন্ত্রণার বাকি একটা অংশ বলে গণ্য করা প্রয়োজন, তবেই তা যত কষ্টময় হোক না কেন অর্থপূর্ণ ও পরিত্রাণদায়ী হবে)। পুস্তকের সমাপ্তি অংশ দেখায় যে, যোব সত্যিই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, ও তাঁর বন্ধুদের মানবীয় বিচারবুদ্ধি একেবারে অনর্থক।

সামসঙ্গীত-মালা
সামসঙ্গীত-মালাই বাইবেলের כְּתוּבִים (কেথুভিম) অর্থাৎ 'অন্যান্য লেখা' নামক তৃতীয় অংশের প্রথম পুস্তক। পুস্তকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটিই ছিল ইহুদীদের প্রার্থনা-পুস্তক; এর অর্থ হল যে এটির মধ্য দিয়েই ইহুদীরা প্রার্থনা করতেন ও প্রার্থনা করতে শিখতেন যেহেতু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সামসঙ্গীতগুলো স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী: মানুষ মুখ খুলবে ও ঈশ্বর তাঁর বাণীতে তা পরিপূর্ণ করবেন (সাম ৮১:১১); আবার, মানুষ কণ্ঠ দেবে ও ঈশ্বরের বাণী (স্বয়ং খ্রীষ্টই) উচ্চারিত প্রার্থনাটা পিতার কাছে নিবেদন করবেন; আরও, বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকের মত এই পুস্তক হাতে তুলে মানুষ যেন আগে শোনে এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাকে কী বলেন, এবং ঈশ্বরের এই বাণী যেন গ্রহণ করে। এই পুস্তক যীশুর নিজের প্রার্থনা-পুস্তক ছিল বিধায় (মথি ২৬:৩০) খ্রীষ্টমণ্ডলীও তা নিজের প্রার্থনা-পুস্তক বলে গ্রহণ করল ও করে থাকে। বাস্তবিকই ইহুদীরা যেমন পুস্তকটা মুখস্থ করছিলেন, মণ্ডলীর ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভক্তদের পক্ষে সমস্ত সামসঙ্গীতগুলো মুখস্থ জানাই ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই পুস্তকে নানা প্রার্থনা খোঁজ করা ছাড়া মানুষ যেন যীশু সংক্রান্ত কতগুলো ভবিষ্যদ্বাণীও খুঁজে বের করায় নিবিষ্ট থাকে, কেননা তিনি নিজে বলেছিলেন সামসঙ্গীত-মালা তাঁর কথা বলে (লুক ২৪:৪৪); সুতরাং প্রার্থনা-পুস্তক ছাড়া সামসঙ্গীত-মালা ধ্যান-পুস্তক বলেও গ্রহণীয়।
সামসঙ্গীত-মালায় সঙ্কলিত সামসঙ্গীতগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা:
(ক) প্রশংসাগান: ৮, ২৯, ৩৩, ৪৬–৪৮, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৮৪, ৮৭, ৯৩, ৯৫–৯৯, ১০৪, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১২২, ১২৯, ১৩৪–১৩৬, ১৩৯, ১৪৫–১৫০;
(খ) ধন্যবাদ-স্তুতি: ১০, ৩০, ৩১, ৪০, ৪১, ৭৩, ৯২, ১০৩, ১০৭, ১১৬, ১৩৮;
(গ) বিলাপ-গান ও সাহায্য-প্রার্থনা: ৩–৭, ১৩, ১৪, ১৭, ২২, ২৫–২৮, ৩৫, ৩৬, ৩৮–৪০, ৪২–৪৪, ৫১, ৫২, ৫৪–৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৬, ৮৮–৯০, ৯৪, ১০৯, ১২০, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৩৭, ১৪০–১৪৩;
(ঘ) প্রজ্ঞাধর্মী সামসঙ্গীত: ১, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৪৯, ১১২, ১১৯, ১২৮, ১২৯, ১৩৩;
(ঙ) আস্থামূলক সামসঙ্গীত: ৪, ১১, ১৬, ২৩, ৬২, ৯১, ১০২, ১২১, ১২৫, ১৩১;
(চ) রাজকীয়-মসীহমূলক সামসঙ্গীত: ২, ৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ৩১, ৪৫, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৮৫, ১০১, ১১০, ১৩২।

প্রবচনমালা
পুস্তকটা সাধারণ সুবুদ্ধির কথা তুলে ধরে না, বরং শুরু থেকেই ঘোষণা করে যে প্রকৃত প্রজ্ঞা প্রভুভয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; অর্থাৎ মানবজ্ঞান-বিকাশ ও প্রভুর প্রতি আত্মনিবেদন পাশাপাশিই থাকবার কথা। উপরন্তু প্রজ্ঞা ঈশ্বরের দান বলেই উপস্থাপিত; অতএব প্রজ্ঞাবান হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা প্রার্থনা করতে হয়; অবশেষে একথাও স্মরণীয় যে, কোন মানুষ যদি নিজের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে

জানতে না পারে, তবে সে যেন নিরাশ না হয়, কেননা ঈশ্বরকে জানবার প্রকৃত পথ মানবজ্ঞান নয়, ঈশ্বর নিজে নিজের বাণী দ্বারাই নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

উপদেশক

বাইবেলের মধ্যে এই পুস্তকই সম্ভবত সবচেয়ে দুরূহ বাণী ব্যক্ত করে; উপদেশক বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কিন্তু যে উত্তর অর্পণ করেন তা আজকের পাঠক-পাঠিকার মন তত জয় করতে পারে না; আসলে উপদেশক চিন্তাশীল ও জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাকেই উদ্দেশ করেন, এবং ঈশ্বর, জগৎ ও মানবজীবন বিষয়ে যত নিশ্চয়তা চ্যালেঞ্জ করেন।

পরম গীত

এই পুস্তকে দাম্পত্য-জীবন ক্ষেত্রে মানব-ভালবাসা সম্বন্ধে ইস্রায়েলীয়দের স্বকীয় ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত: ঈশ্বর যা যা সৃষ্টি করেছেন তা সবই ভাল ও উত্তম, সুতরাং কীর্তনীয়। এই আক্ষরিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রতীকমূলক ব্যাখ্যাও যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে: ইহুদী ঐতিহ্য ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের (বা ঈশ্বরের বাণীর) ভালবাসা, এবং খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য মণ্ডলীর প্রতি, কিংবা মানবজাতির প্রতি, বা প্রতিটি মানবাত্মার প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসার কথা তুলে ধরে: ঈশ্বর মানুষকে গভীরভাবেই ভালবাসেন, মানুষ বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের অবিরত অন্বেষণ করে ও তখনই মাত্র তৃপ্তি পায় যখন তাঁকে খুঁজে পায়। ভালবাসা এক দিনের ব্যাপার নয়, দুই পক্ষের ঐক্যলাভই তার উদ্দেশ্য, যা সারা জীবনেরই প্রচেষ্টা।

প্রজ্ঞা পুস্তক

এই পুস্তক হিব্রু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়; তা সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৫০ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় (মিশরে) গ্রীক ভাষায় লেখা হয়। প্রথম অংশে (১–৫ অধ্যায়) বিশ্বস্ত ভক্তজনের নিয়তি সঙ্কীর্তিত: মৃত্যুর পরে তারা অমরতায় ভূষিত হবে; এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল এ, প্রজ্ঞা পুস্তকই প্রথম মানবাত্মার অমরতা স্পষ্টভাবে সমর্থন করে। দ্বিতীয় অংশে (৬–৯ অধ্যায়) প্রজ্ঞার প্রখ্যাত গুরু সলোমন প্রজ্ঞার গুণকীর্তন করেন ও মানুষকে প্রজ্ঞার অন্বেষণ করতে প্রেরণা দেন। তৃতীয় অংশ মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতির মুক্তি-যাত্রা সৌন্দর্য-মণ্ডিত ভাষায় বর্ণনা করে। কিন্তু পুস্তকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এ হল যে, প্রজ্ঞা ব্যক্তি-বিশেষ রূপেই উপস্থাপিত: প্রজ্ঞাই এজগতে ঈশ্বরের যত কর্মের মাধ্যম, আবার প্রজ্ঞা ঐশস্বরূপের সহভাগী; এভাবে এমন পটভূমিকা প্রস্তুত করা হয় যাতে নবসন্ধির ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা যীশুকেই ঈশ্বরের মাংসধারী প্রজ্ঞা বলে আবিষ্কার করতে পারে (সাধু যোহন ও পলের ঐশতত্ত্বই এধারণা দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত)।

বেন-সিরা

সিরার ছেলে যীশু যেরুসালেমের একজন শাস্ত্রী যিনি ঐশবিধান ও মন্দিরের ঐশ উপাসনার মাহাত্ম্য তুলে ধরবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের ইতিহাসের অতীতকালের মহাব্যক্তিত্বের প্রতিও যথেষ্ট ভক্তি প্রকাশ করেন। নানা উপযোগী বাণী প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে একথাই ঘোষণা করেন যে, প্রজ্ঞা ঈশ্বর থেকে আগত, এবং তা বিধানের মধ্য দিয়েই প্রাপ্য। পুস্তকটার মূলপাঠ হিব্রু ভাষায় লিখিত (এই মূলপাঠের অধিকাংশ সম্প্রতিকালে পাওয়া গেল), কিন্তু বেন-সিরার (অর্থাৎ সিরার ছেলে যীশুর) একজন নাতি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০ সালে তা গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। পুস্তকের পদের ধারাবাহিক সংখ্যাগুলো লাতিন পাঠের সংখ্যা অনুসরণ করে, কিন্তু যেহেতু লাতিন পাঠে বেশি পদ যোগ দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য নানা স্থানে পদের সংখ্যার পূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

ইসাইয়া

এই পুস্তক বাইবেলের 'নবীগণ' বিভাগের দ্বিতীয় অংশের প্রথম পুস্তক। পুস্তকটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

(ক) নবীদের দ্বারা ঘোষিত ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতা দেখানোর ব্যাপারে ইস্রায়েল জনগণ যথেষ্ট অবহেলা করেছে; মন ফেরাতে অনিচ্ছুক বলে তারা কঠোর বিচারে বিচারিত হয়ে নির্বাসিত হবে; মন ফেরালে মুক্তিদান নিশ্চিত বলে প্রতিশ্রুত (১–৩৯ অধ্যায়)।

(খ) ইস্রায়েল এই আশ্বাস বাণী শোনে যে, তারা প্রভুর ক্ষমালাভের যোগ্য হবে: প্রভু নিজেই হবেন তাদের মুক্তিসাধক, এবং ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে তাদের নিজের গৌরবের অংশী করবেন; কিন্তু মন না ফেরালে ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত বলে ঘোষিত (৪০–৫৫ অধ্যায়)।

(গ) ইস্রায়েল শুধু নয়, সকল দেশ ও জাতিই হবে প্রভুর সাধিত নবসৃষ্টির পাত্র; এমনকি আকাশ ও পৃথিবীও পুনঃসৃষ্ট হবে। ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইস্রায়েলের বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত। সকলেই পরিত্রাণ পেতে আহূত, কিন্তু সদাচরণ না করলে মানুষ সার্বজনীন পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হবে (৫৬–৬৬ অধ্যায়)।

এক কথায়, দ্বিতীয় বিবরণের আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসাইয়া পুস্তক প্রভুর পরাক্রান্ত বাণীর গুণকীর্তন করে: সেই বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে, ঐশইচ্ছা অনুসারে মানবেতিহাসকে বিচার করে, এবং নবী দ্বারা যে রায় ঘোষণা করে তার সিদ্ধিও ঘটায়। এই বাণীর প্রতি বাধ্যতাই পরিত্রাণ লাভের চাবিকাঠি।

ইসাইয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪০ সালে নবী বলে আহূত হন।

যেরেমিয়া (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)

অন্যান্য নবীদের মত যেরেমিয়ার বাণীপ্রচারের বিষয়বস্তুও দ্বিতীয় বিবরণের ঐশতত্ত্ব দ্বারা চিহ্নিত; ইস্রায়েল জাতির আসন্ন সর্বনাশ কথাকর্মে ব্যক্ত করলেও তিনি প্রত্যাশাপূর্ণ বাণীও প্রচার করেন। তিনি এমন নতুন সন্ধি প্রচার করেন যা হৃদয়েই সম্পাদিত হবে, ও ঈশ্বরের সঙ্গে এমন নতুন সম্পর্কের ভবিষ্যদ্বাণী দেন যা ব্যক্তিময়ই সম্পর্ক; ঠিক এ আশ্বাসজনক বাণীই সর্বকালের পাঠক-পাঠিকার কাছে নবী যেরেমিয়াকে জনপ্রীয় করেছে।

বিলাপ-গাথা

রচনা-কালে পুস্তকের আলোচ্য-বিষয় ছিল যেরুসালেম-অবরোধ ও যারা রেহাই পেয়েছিল তাদের দুর্দশা। কিন্তু ইতিহাসের সেই কাল অতিক্রম করে পুস্তকটা এখন প্রতীকমূলক অর্থ বহন করে, যেন সর্বকালের পাঠক-পাঠিকা অসহ্য দুর্দশার সময়ে এই আশা রাখতে পারে যে, ঈশ্বর যেমন সেসময় শাস্তি দেওয়ার পর সুপ্রচুর আশীর্বাদ দান করেছিলেন, তেমনি এখনও নিজ দয়া সবসময়ের মত ফিরিয়ে নেবেন না। এক কথায়: ঈশ্বর ক্ষত করেন, কিন্তু আবার বেঁধে দেন। —পুস্তকের রচয়িতা কে? এবিষয়ে হিব্রু মূলপাঠে কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু গ্রীক, আরামীয় ও লাতিন পাঠ অনুসারে নবী যেরেমিয়াই পুস্তকের লেখক।

বারুক

এই পুস্তকে আলাদা আলাদা চারটে রচনা সঙ্কলিত যা নির্বাসিত ইহুদীদের আধ্যাত্মিকতা, ঐশবিধানের প্রতি তাদের ভক্তি, তাদের তপস্যার মনোভাব, ও তাদের মসীহমুখী প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। পুস্তকটা সম্ভবত বারুকের নিজের রচনা নয়, বরং খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীরই অজানা কোন না কোন ইহুদীর রচনা। ৬ষ্ঠ অধ্যায় মাঝে মাঝে আলাদা এক পুস্তক বলে ছাপা, তখন পুস্তকের নাম হয় 'যেরেমিয়ার পত্র', এবং আলাদা পুস্তক বলে ছাপা হওয়ার ফলে বাইবেলের পুস্তকাবলির মোট সংখ্যা তিয়াত্তরে দাঁড়ায়।

এজেকিয়েল (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)

নিজে একজন যাজক হওয়ায় নবী এজেকিয়েলের কাছে মুখ্য বিষয় হল প্রভুর গৌরব; নির্বাসিত মানুষ হলেও তাঁর কাছে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো কেমন যেন খুঁটিনাটি ব্যাপার যা গৌরবময় ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা লঙ্ঘন করতে পারে না। তাঁর মত কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত ভাবীকালের সকল মানুষের কাছে তিনি অতুলনীয় এক দৃঢ় বিশ্বাসের এই অবদান রাখেন যে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ বিশ্বস্ততা দেখিয়ে মানুষ যেন প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রভুর গৌরবের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে জীবন-পথে এগিয়ে চলে। প্রভুর গৌরবই যে আমাদের প্রতি তাঁর যত্ন ও মমতার শামিল।

দানিয়েল
ইস্রায়েলীয়েরা বাবিলনে নির্বাসিত, রাজ্য হিসাবে ইস্রায়েল বিনষ্ট। কিন্তু যে সকল রাজ্য বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোও একটার পর একটা বিনষ্ট হবে; তখন মাত্র একটি রাজ্য থাকবে যা ঈশ্বরেরই রাজ্য ও মানবপুত্রই যার শাসনকর্তা। হতাশাগ্রস্ত ইহুদীদের কাছে ঈশ্বরের ভাবী রাজ্যের এই প্রত্যাশা অর্পণ করাই পুস্তকের অভিপ্রায়, শ্রোতামণ্ডলী যেন বিজাতীয়দের ধর্মীয় প্রথা অনুসারে না চলে মৃত্যুবরণ পর্যন্তই বরং প্রকৃত বিশ্বাস-পথে চলে।
** দানিয়েল পুস্তকে বাঁকা অক্ষরে যা লেখা আছে, তা হিব্রু মূলপাঠের নয়, গ্রীক পাঠেরই অংশ-বিশেষ।

হোসেয়া (খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী)
নবী হোসেয়ার নাটকীয় জীবন এমন প্রতীক বলে গণ্য করা উচিত যা অবিশ্বস্ত ইস্রায়েলের প্রতি (ও অবিশ্বস্ত মানবজাতির প্রতি) কৃপাময় ঈশ্বরের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা তুলে ধরে। মানুষের যে অবিশ্বস্ততা ঈশ্বর সহ্য করেন না, তা হল দূষিত উপাসনা-কর্ম, সামাজিক অন্যায্যতা, ও ঈশ্বরে অনাস্থা।

যোয়েল (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ বা ৪র্থ শতাব্দী)
এই পুস্তকের প্রথম দুই অধ্যায় কেমন যেন সেকালের ইস্রায়েলের একটা মনপরিবর্তন-সভা যা সর্বকালের মানুষের জন্যও পালনীয়; তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় প্রতিশ্রুতিই যেন রচিত: প্রভুর শেষ দিনে সকল জাতি নবায়িত ও পরিত্রাণকৃত হবে।

আমোস (খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী)
অধিকাংশ নবীদের মত নবী আমোসও বাহ্যিক ধর্মপালন ও অন্যায্যতার বিরুদ্ধে বাণী দেন। প্রভুর শাস্তির দিন সন্নিকট, ইস্রায়েল দণ্ডভোগ করবে; কিন্তু অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত মানুষ রেহাই পাবে।

ওবাদিয়া (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)
এই পুস্তকে ঈশ্বরের রাজ্য সংক্রান্ত এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যা অনুসারে বিধর্মী দেশগুলোর দুরভিসন্ধি শেষ করে দেওয়া হবে এবং ইস্রায়েলের এক অবশিষ্টাংশ ঐশরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

যোনা
পুস্তকটা একটি সদুপদেশ (মিদ্রাশ) যার মধ্য দিয়ে ইহুদীদের শেখানো হয় ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে বিধর্মীদের প্রতি কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। 'যোনা' শিরনাম পুস্তকের রচয়িতাকে নয়, কাহিনীর প্রধান চরিত্রকেই লক্ষ করে।

মিখা (খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী)
নবী ইসাইয়ার মত নবী মিখাও দাউদকুলে স্থাপিত মসীহ-প্রত্যাশা তুলে ধরেন; তাছাড়া অন্যান্য নবীদের মত তিনিও সামাজিক অন্যায্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

নাহুম (খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী)
ঈশ্বরের পরাক্রম ইস্রায়েলের শত্রুদের চেয়ে পরাক্রমশালী: তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসন-দেশ সেই নিনিভে ধ্বংস করবেন, এবং নিনিভে যার প্রতীক সেই সমস্ত অমঙ্গলও ধ্বংস করবেন; অতএব, নির্বাসিতেরা যেন নিরাশ না হয়, বরং প্রভুর অনিবার্য বিজয়লাভে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

হাবাকুক (খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী)
সমস্ত কিছু ঈশ্বরের হাতে: অবিশ্বস্ততার জন্য ইস্রায়েল (মানুষ) শাস্তিভোগ করবে, কিন্তু তাদের (মানুষের) অত্যাচারীরাও শাস্তিভোগ করবে, এ হল এই পুস্তকের সারকথা।

জেফানিয়া (খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী)
এই পুস্তকের মূলসুর হল প্রভুর দিন: সেদিনে যুদাকে ও সকল দেশ শোধন করা হবে। যারা রেহাই পাবে তারা প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত এক অবশিষ্টাংশ বলে জীবনযাপন করবে।

হগয় (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)
যেরুসালেমে ফিরে আসা নির্বাসিতদের জনমণ্ডলীর প্রথম নবী এই হগয়; মন্দির-পুনর্নির্মাণ ও বিশুদ্ধ উপাসনাই তাঁর বাণীর বিষয়বস্তু।

জাখারিয়া (৬ষ্ঠ শতাব্দী)
পুস্তকটা দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) মন্দির-পুনর্নির্মাণকাজ ও শুদ্ধ উপাসনা, এবং রাজ-মসীহমুখী প্রত্যাশাই প্রথম অংশের বিষয়বস্তু (১–৮ অধ্যায়); (খ) মসীহমুখী প্রত্যাশা (৯–১১ অধ্যায়) ও চরমকালে যেরুসালেমে প্রভুর মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী (১২–১৪ অধ্যায়) দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয়।

মালাখি (খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী)
৩ অধ্যায় প্রথম পদে উল্লিখিত 'মালাখি' (আমার দূত) শব্দ থেকেই পুস্তকের অজানা লেখকের নাম ধরে নেওয়া হয়েছিল। পুস্তকের বিষয়বস্তু হল প্রভুর দিন ও শুদ্ধ উপাসনা।

সুসমাচার
সুসমাচার বলতে কি বোঝায়? ঈশ্বরের চরম প্রকাশকর্তা রূপে যীশুখ্রীষ্ট মানবজাতির কাছে পরিত্রাণের যে শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন, তা-ই সুসমাচার বলে। সুসমাচারের উৎপত্তির নেপথ্যে রয়েছে আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীকালীন বাণী-প্রচার: বাস্তবিকই পুনরুত্থিত যীশুর আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী শুরু থেকেই মানুষের কাছে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র, জগত্রাতা ও বিশ্বপ্রভু বলে ঘোষণা করতে লাগল। তবে দেখা যাচ্ছে, যীশু নিজেই সেই সুসমাচার যা কালের পূর্ণতায় ঈশ্বর মানুষকে জানিয়েছেন; ফলত যীশু যে যে কাজ সাধন করলেন ও যে যে বাণী প্রচার করলেন তাও সুসমাচার বলে গ্রহণযোগ্য। কথাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সুসমাচারের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে পাঠক-পাঠিকা সর্বপ্রথমে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যীশুকেই নিজ জীবনের ব্যক্তিময় সুসমাচার বলে গ্রহণ করতে আমন্ত্রিত, এবং পরে তাঁর বিষয়ে নানা কথা জানতে আহূত। সুতরাং সুসমাচার পাঠ করার সময়ে যীশু নিজে সমগ্র মণ্ডলী ও প্রত্যেকজন পাঠক-পাঠিকার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দেন; যারা দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাদের কাছে নিজেকে ও পিতাকে প্রকাশ করে তিনি অমঙ্গল, পাপ ও মৃত্যু থেকে তাদের পরিত্রাণ করেন, অর্থাৎ তাদের কাছে নিজেকেই জীবন বলে দান করেন (যোহন ২০:৩০-৩১)।

মথি-রচিত সুসমাচার
মথি-রচিত সুসমাচার 'স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার' বলে অভিহিত, কেননা প্রথম থেকেই যীশু এমন রাজারূপে উপস্থাপিত যিনি সমগ্র বিশ্বের সম্মানের পাত্র, এবং এমন স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচার করেন যা তাঁর শিষ্যমণ্ডলী নিজ জীবনে যথাসাধ্য ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবে। আরও, যীশু সনাতন শিক্ষাগুরু বলেও উপস্থাপিত, বাস্তবিকই এই পুস্তকে তাঁর পাঁচ উপদেশ রয়েছে (৫–৭ অধ্যায়: পর্বতে উপদেশ; ১০–১১ অধ্যায়: বাণীপ্রচার সংক্রান্ত উপদেশ; ১৩ অধ্যায়: নানা উপমা-কাহিনী; ১৮ অধ্যায়: মণ্ডলী সংক্রান্ত উপদেশ; ২৪–২৫ অধ্যায়: শেষ উপদেশ) যাতে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মোশী

যেমন ছিলেন প্রাচীন ইস্রায়েলের বিধানকর্তা, তেমনি যীশুই এখন নব ইস্রায়েলের বিধানকর্তা। এক কথায়: যীশু মসীহ-রাজ ও চরম বিধানকর্তা।

মার্ক-রচিত সুসমাচার

সম্ভবত এই মার্ক-রচিত সুসমাচারই প্রথম লিখিত সুসমাচার। অন্যান্য সুসমাচারের তুলনায় এই সুসমাচার যীশুর বিশেষ কোন শিক্ষা উপস্থাপন করে না। তার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল স্বয়ং যীশুর রহস্যাবৃত ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্ব এমন যা পিতা ও শয়তান দ্বারা স্বীকৃত, অথচ ইহুদী ধর্মনেতারা তেমন রহস্যাবৃত ব্যক্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করেন, শিষ্যেরা নিজেরাও তা ভুল বোঝেন। পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই সাধু মার্কের রচনা-রীতির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবেন: যীশু কেমন যেন সবসময় ত্বরা করেই সবকিছু করেন (উদাহরণ স্বরূপ: তিনি 'তখনই' গেলেন, 'তখনই' প্রবেশ করলেন, ইত্যাদি); এই রচনা-রীতির মধ্য দিয়ে সাধু মার্ক পাঠক-পাঠিকাকে বোঝাতে চান যে, যীশু অবিরত ক্রুশের দিকেই ছুটে চলেন, কোথাও থামতে চান না; আর পাঠক-পাঠিকাকেও তিনি আমন্ত্রণ জানান যেন যীশুর অনুসরণে তাঁরাও কোথাও না থেমে অবিরত সেই ক্রুশের দিকে ছুটে চলেন, কেননা শুধু সেইখানে, সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশু-দর্শনেই, তাঁর সেই রহস্যাবৃত ব্যক্তিত্ব অনাবৃত হবে; তখনই তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করতে পারবেন।

লুক-রচিত সুসমাচার

সাধু লুকের লেখায় যীশু বিশেষভাবে গরিব ও সমাজে ছোট বলে পরিগণিত যারা তাদেরই উদ্দেশ করে ইহুদী-অনিহুদী সকলকেই পরিত্রাণ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করেন; হয় তো এই কারণেই এই সুসমাচার গরিব,

কম-শিক্ষিত ও সামাজিক দিক থেকে মানবাধিকার-বঞ্চিত মানুষের হৃদয় জয় করেছে ও করে থাকে। যে বিষয়ের উপর সাধু লুক বিশেষ জোর দেন তা হল ভক্তজনের জীবনে পবিত্র আত্মার ভূমিকা যা প্রার্থনা, আনন্দ, ও ঈশ্বরের স্তুতিগানে ব্যক্ত হয়; ধনসম্পদের বিষয়েও তিনি ভক্তজনকে সতর্ক থাকতে বলেন। তাঁর লেখা সুসমাচারের প্রথম ও শেষ দৃশ্য যেরুসালেমকেই কেন্দ্র করে: সেখান থেকেই পরিত্রাণ-সংবাদ বিস্তার লাভ করতে শুরু করে, সেইখানে যীশুর পরিত্রাণকর্মের গন্তব্যস্থল, আবার সেখান থেকেই প্রেরিতদূতদের প্রেরণকর্ম বিস্তার লাভ করতে শুরু করবে।

যোহন-রচিত সুসমাচার

অন্যান্য সুসমাচারের তুলনায় এই সুসমাচার ভিন্ন ধরনেরই লেখা বলে প্রতীয়মান, কেননা বহু বহু পরাক্রম-কর্ম ও উপমা-কাহিনী বর্ণনা না করে কয়েকটা চিহ্ন-কর্ম ও ঘটনা উপস্থাপন করে সেগুলোর অর্থ সুদীর্ঘ ঐশতাত্ত্বিক নানা উপদেশে ব্যক্ত করে; আর উপদেশের আলোচ্য বিষয় সবসময়ই এক, তথা: যীশুই পরমপিতাকে প্রকাশ করেন ও যীশুতে পরমপিতা প্রকাশিত। এই সুসমাচারের আর একটা দিক লক্ষণীয়: সমস্ত ঘটনা এক ক্ষণেরই দিকে ধাবিত, ক্ষণটা হল যীশুর মৃত্যু-পুনরুত্থান-স্বর্গারোহণের একক ক্ষণ যা মসীহ-রাজের গৌরব-ক্ষণ বলেও অভিহিত। এই সুসমাচারের গভীর ঐশতত্ত্ব অধিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি করে; প্রত্যাশা রাখি, পাঠক-পাঠিকা অনুভব করবেন যে, আমাদের সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনিতে তেমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

শিষ্যচরিত (আক্ষরিক অনুবাদ: প্রেরিতদূতদের কর্মকাহিনী)

খ্রীষ্টবিশ্বাস যুদেয়া অঞ্চল থেকে নানা দেশে বিস্তার লাভ করে অবশেষে রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমে পৌঁছে, এ হল শিষ্যচরিতের আলোচ্য বিষয়। পুস্তকের প্রধান মানব-চরিত্র হলেন প্রেরিতদূতদের প্রধান সাধু পিতর ও বিজাতীয়দের প্রেরিতদূত সাধু পল। তথাপি সাধু লুক এই কথাও দেখাবার জন্য খুবই সচেষ্ট যে, পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীর জীবনে প্রধান চরিত্র; বাস্তবিকই ভক্তমণ্ডলী পুনরুত্থিত যীশুর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ, তিনি সদা নতুন কাজে প্রেরণা দান করেন, আবার তিনিই মণ্ডলীর প্রার্থনা-জীবন, তাদের আনন্দ ও স্তুতিগান উদ্দীপিত করেন, তিনিই নির্যাতনের দিনে ভক্তদের সুস্থির করেন ও দানশীলতা-মনোভাব দানে তাদের হৃদয় উদার করেন। এই সমস্ত ঐশতাত্ত্বিক দিকগুলোর জন্য পুস্তকটা খ্রীষ্টমণ্ডলীর নবায়ন ক্ষেত্রে এখনও অধিক চেতনা প্রদান করে থাকে। পুস্তকের রচয়িতা সেই সাধু লুক

যিনি তৃতীয় সুসমাচারেরও রচয়িতা; শিষ্যচরিত তৃতীয় সুসমাচারের ধারাবাহিকতার দ্বিতীয় অংশ বলে গণ্য করা উচিত।

প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি

রোমীয়দের কাছে পত্র

পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষের পক্ষে খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস রাখা দরকার; খ্রীষ্টে বিশ্বাস ছাড়া পরিত্রাণ পাবার আর কোন উপায় নেই; প্রাক্তন সন্ধির বিধানেরও সেই ক্ষমতা নেই, কেননা বিধান ছিল একপ্রকার অগ্রদূত: আসল ব্যক্তি একবার উপস্থিত হলে অগ্রদূত সরে যায়। মানবপরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্ট যে কী না সহ্য করেছিলেন, একথা উপলব্ধি করে সাধু পল তাঁকে নিজের জীবনের একমাত্র প্রভু বলে গ্রহণ করলেন, এবং নিজ পত্রের মধ্য দিয়ে এখনও মানুষকে আহ্বান করে থাকেন যেন তারাও যীশুকে জীবনস্বামী বলে গ্রহণ ক'রে কেবল তাঁর উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। খ্রীষ্টের প্রতি সাধু পলের অসাধারণ অনুরাগ তাঁর লেখার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়; এই পত্রে শুধু নয়, তাঁর সকল পত্রেই অধিক গভীরতম ঐশতাত্ত্বিক ধারণা উপস্থিত বলে তাঁর বক্তব্যের অর্থ বোঝা সবসময় সহজ ব্যাপার নয়।

করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্র

করিন্থ-মণ্ডলীতে যে নানা সমস্যা উঠেছিল, এই পত্রের মধ্য দিয়ে সাধু পল সেই সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে মৃতদের (ও খ্রীষ্টের) পুনরুত্থান, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলে খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টের দেহ বলে মণ্ডলী ও পবিত্র আত্মার দেওয়া অনুগ্রহদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করিন্থীয়দের কাছে ২য় পত্র

করিন্থ মণ্ডলীর সঙ্গে সাধু পলের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কঠিন হয়ে উঠেছিল, এব্যাপারে যত সমস্যার সমাধান করার জন্যই তাঁর এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। তবু কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজের প্রৈরিতিক কাজ ও খ্রীষ্টের গৌরবময় আলো সম্বন্ধেও কথা বলেন, যে আলো দ্বারা আমরা যীশুর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হই। যেরুসালেমের অভাবী মণ্ডলীর জন্য চাঁদা তোলার বিষয়েও তিনি যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেন, কেননা তেমন দানশীলতা প্রকাশে করিন্থীয়েরা যীশুর নিজের উদার দানশীলতার আদর্শ পালন করবে। পত্রের শেষাংশে সাধু পলের নিজস্ব কথা ব্যক্ত, তাতে জানা যায় খ্রীষ্টপ্রেমের খাতিরে তাঁকে কতই না প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হল।

গালাতীয়দের কাছে পত্র

খ্রীষ্টবিশ্বাসে দীক্ষিতদের পক্ষে ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্য কতখানি পালন করা আবশ্যক, আদিমণ্ডলী-কালে এ-ই ছিল নানা ঐশতাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে একটা। এবিষয়ে সাধু পলের কথা এ: যীশুর আগমনে প্রাক্তন বিধানের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, খ্রীষ্টভক্তদের পক্ষে খ্রীষ্টের ক্রুশ ও বিশ্বাসই হল পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়। পত্রটির আলোচ্য বিষয় রোমীয়দের কাছে পত্রেও বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত।

এফেসীয়দের কাছে পত্র

সেসময় এক দল খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিল যারা সমর্থন করত, আদিম কতগুলো শক্তিই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাদের বিপক্ষে পত্রটি বলে: খ্রীষ্টই সার্বিক ক্ষমতা রাখেন: তিনিই বিশ্বসৃষ্টি ও মণ্ডলীর শীর্ষপদে রয়েছেন, এবং মণ্ডলী তাঁর দেহ।

ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্র

ফিলিপ্পী-মণ্ডলীই ছিল সাধু পলের প্রিয় মণ্ডলী; তাদের কাছ থেকে ছাড়া তিনি অন্য কারও কাছ থেকে কখনও সাহায্য গ্রহণ করে নেননি। খ্রীষ্টের অবমাননা ও গৌরবোন্নয়ন এবং কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে সাধু পলের জীবনময় সংযোগই পত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সুন্দরতম অংশ।

কলসীয়দের কাছে পত্র

ইহুদী ধর্ম থেকে আগত কোন কোন খ্রীষ্টভক্ত স্বর্গদূত ও আদিম শক্তিবৃন্দের প্রতি বেশি সম্ভ্রম দেখাতে প্রবণ ছিল বিধায় সাধু পল এই পত্র লিখে এমন খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করেন যিনি সমস্ত শক্তির ঊর্ধ্বে। রোমীয়দের কাছে পত্রের নানা প্রসঙ্গও এখানে উল্লিখিত।

থেসালোনিকীয়দের কাছে ১ম ও ২য় পত্র

থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রথম পত্রই হল সাধু পলের লেখা প্রথম পত্র। তার আলোচ্য বিষয় হল খ্রীষ্টের পুনরাগমন, যা তাঁর মতে খুবই সন্নিকট; এই প্রসঙ্গের উপর তিনি যে জোর দিয়েছিলেন তার ফলে থেসালোনিকীয়েরা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি তাদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তাদের কাছে আর একটা পত্র লিখতে বাধ্য হলেন।

তিমথি ও তীতের কাছে পত্র

এই তিন পত্র পালকীয় পত্র বলে পরিচিত, কেননা সাধু পল আপন শিষ্যদের মণ্ডলীর পালকীয় কাজ পালনের বিষয়ে পরামর্শ দেন। এই পত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সেকালের মণ্ডলীগুলোর কাঠামো ও নানা সেবাকর্ম সম্বন্ধীয় তথ্যও জানা যায়।

ফিলেমনের কাছে পত্র

এই পত্রে সাধু পলের খ্রীষ্টীয় উজ্জ্বল মনোভাব প্রকাশিত।

হিব্রুদের কাছে পত্র

প্রাক্তন সন্ধিকালীন ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি খ্রীষ্টের আত্মবলিদানে ও তাঁর রক্তে সাধিত সন্ধিতে পূর্ণতা লাভ করেছে: লেবীয় যাজকত্ব যা সাধন করতে অক্ষম ছিল, খ্রীষ্টই তা সাধন করতে সক্ষম হলেন বিধায় তিনি লেবীয় যাজকত্বের স্থান পেয়েছেন, এমনকি তিনিই বিশ্বজগতের অনন্য যাজক ও মধ্যস্থ। এই মুখ্য বিষয় ছাড়া পত্রে আলোচিত অন্য বিষয়ও উল্লেখযোগ্য যেমন, মণ্ডলী স্বর্গ-তীর্থের দিকে যাত্রী, এই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রাপথে যেন ভেঙে না পড়ে সে প্রাক্তন সন্ধিকালের প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বের আদর্শের দিকে চোখ তুলে বিশ্বাসে নিজেকে বলবান করে তোলে। দিশেহারা ভক্তজনকে খ্রীষ্টীয় জীবনে উৎসাহিত ও পরিপক্ক করে তোলার জন্য পত্র প্রতিকার হিসাবে এমন পদ্ধতি উপস্থাপন করে যা সর্বকালোপযোগী: নৈতিক উপদেশ যথেষ্ট নয়, খ্রীষ্ট-রহস্য সংক্রান্ত গভীর ধ্যানমূলক শিক্ষাই একান্ত প্রয়োজন।

যাকোবের পত্র

পত্রটি একথার উপর জোর দেয় যে, খ্রীষ্টবিশ্বাস সৎকর্মেই প্রকাশ পাবার কথা, না হলে তা বিশ্বাস নামের যোগ্য নয়। পত্রটি সদাচরণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও উপযোগী পরামর্শ দেয়।

পিতরের ১ম পত্র

এশিয়া প্রদেশের নির্যাতিত মণ্ডলীগুলোকে সাহস ও আশ্বাস দেওয়াই এই পত্রের উদ্দেশ্য; পত্রটির বক্তব্য এ: খ্রীষ্টবিশ্বাসী ক্লেশের দিনে খ্রীষ্টের কষ্টভোগের সহভাগী হয়েই নিজের যথার্থতা প্রমাণ করবে। এবিষয় ছাড়া দীক্ষাস্নান সংক্রান্ত খুবই ব্যবহারিক পরামর্শ দানে সাধু পিতর নবদীক্ষিতদের উদ্বুদ্ধ করতে চান: দীক্ষাস্নানে মানুষ এমন নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে যা পবিত্রতাই দাবি করে।

পিতরের ২য় পত্র

যীশুর পুনরাগমন সন্নিকট, তাই ভক্তজন ধৈর্য ও জাগ্রত নিষ্ঠার সঙ্গে সেদিনের অপেক্ষায় থাকুক: এটিই পত্রের বাণী। ১:৩-৪ অনুচ্ছেদটা ঐশতাত্ত্বিক ধারণায় পূর্ণ, কিন্তু ভাষাগত দিক দিয়ে তা বোঝা খুবই কঠিন।

যোহনের ১ম পত্র

যোহন-রচিত সুসমাচার যত বিষয়-বস্তু গভীরতম ভাষায় ব্যক্ত করে, এই পত্র সহজ ভাষায় সেই বিষয়-বস্তু পুনরুত্থাপন করে, যেমন পিতার প্রকাশকারী ব্যক্তি হিসাবে খ্রীষ্ট; আলো, ভালবাসা ও সত্যের উৎস খ্রীষ্ট, ইত্যাদি। খ্রীষ্টীয় জীবন বিশ্বাস ও ভালবাসার দুই আজ্ঞা অনুযায়ী যাপিত হওয়া চাই: ঈশ্বরের পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস ও ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা। তেমন জীবন যাপন করলে ভক্তজন খ্রীষ্টের সেই জীবনের সহভাগী হবে খ্রীষ্ট নিজে পিতার সঙ্গে যে জীবনের সহভাগী।

যোহনের ২য় পত্র

২য় পত্রে সাধু যোহন সতর্ক বাণী দেন যেন প্রকৃত বিশ্বাসী সেই ভ্রান্তমত থেকে দূরে থাকে যা স্বর্গীয় খ্রীষ্ট ও নাজারেথীয় যীশুকে এক বলে না মানায় দেহধারণ-রহস্য অস্বীকার করত।

যোহনের ৩য় পত্র

একজন ধর্মনেতা ভক্তদের মধ্যে অমিল সৃষ্টি করছেন বিধায় সাধু যোহন নিজ বাণী শোনান।

যুদের পত্র

পত্রটি মিথ্যা ধর্মগুরুদের বিষয়ে ভক্তজনদের সতর্ক করে, এবং খ্রীষ্টের দয়া ও রক্ষায় আশ্রয় নিতে তাদের আহ্বান করে।

যোহনের কাছে প্রত্যাদেশ

বর্তমানকালে প্রত্যাদেশ পুস্তকের দু'টো দৃষ্টিকোণই বিশেষভাবে প্রচলিত: প্রথম দৃষ্টিকোণ অনুসারে পুস্তকটি খ্রীষ্টের পুনরাগমন সম্বন্ধেই কথা বলে; দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে, মানব-জগতে খ্রীষ্টের সনাতন ও অবিরত আত্মপ্রকাশই পুস্তকের বিষয়-বস্তু, যে-আত্মপ্রকাশ তাঁর মৃত্যু-পুনরুত্থান-স্বর্গারোহণ-একক ক্ষণেই সাধিত হয়েছিল। প্রথম দৃষ্টিকোণ খুব প্রচলিত, ঐশতাত্ত্বিক দিক থেকেও খুব সহজে বোধগম্য, কিন্তু চতুর্থ সুসমাচারের সঙ্গে তার কোন মিল নেই; দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ চতুর্থ সুসমাচারের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, এবং চতুর্থ সুসমাচারের ঐশতত্ত্ব যেমন, এর ঐশতাত্ত্বিক নানা দিকও তেমনি যথেষ্ট কঠিন। নানা অনুচ্ছেদের শিরনাম ও নিম্নলিখিত টীকা-টিপ্পনি দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, যদিও একথা স্বীকার্য যে, স্থানাভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দেওয়ার ফলে নানা প্রতীকের অর্থ অপূর্ণাঙ্গই থেকে যাবে, আর সেইসঙ্গে দৃষ্টিকোণটাও অস্পষ্ট থেকে যাবে; প্রকৃত ব্যাখ্যা পাবার জন্য অন্য পুস্তকের উপর নির্ভর করা দরকার যেখানে প্রতিটি পদের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু যোহনের এই লেখার অচিন্তনীয় গভীরতা প্রকাশ পায়। [পুস্তকের নাম 'ঐশপ্রকাশ' রাখাই যুক্তিসঙ্গত ছিল; পুরাতন নাম প্রচলিত বলেই তা রক্ষা করা হয়েছে।]